বহু দুর্ঘটনার সাক্ষী বাবা তারকনাথ

শ্রাবণ মাস এলেই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রবল বৃষ্টি সহ্য করে পথে নামেন। গন্তব্য গঙ্গা বা কাছাকাছি অন্য যে কোনও নদী। নদীতে গিয়ে দু'ঘড়া জল ভরে, শিবমন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় সেই জল ঢালেন। প্রথাটি অদ্‌ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু এ ভাবেই হিন্দুধর্ম যুগে যুগে গঙ্গা ও ভক্তিপ্রাণ মানুষের মধ্যে কায়িক-মানসিক সংযোগ সাধন করে চলেছে। গঙ্গা তো শুধু এক নদী নয়, সর্বগ্রাহী এক ধর্মেরও রূপক। ঘটনাচক্রে আমাদের রাজ্যের তিন প্রধান তীর্থ— গঙ্গাসাগর, কালীঘাট ও তারকেশ্বর— গঙ্গার সঙ্গে ওতপ্রোত। এদের মধ্যে তারকনাথের মন্দিরটি তুলনায় নবীন। তবু, তারকেশ্বরের ইতিহাস ঘাঁটলে বাঙালির ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। 'মহালিঙ্গার্চ্চন' গ্রন্থে লেখা আছে: "ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈবচ/ বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বর।"

১৯৫০-এর দশকে বিনয় ঘোষ বারবার বলে গিয়েছেন, তারকেশ্বরের শিবপুজো চরিত্রগত দিক দিয়ে উত্তর ভারতীয়। কলকাতা হাইকোর্টও ১৯৩৪ সালে একই কথা বলেছে। কোর্টের বক্তব্য ছিল, "বাংলায় দশনামী মঠ স্থাপন করেছিলেন দেশের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি থেকে আসা ব্রাহ্মণরা", স্থানীয় ব্রাহ্মণরা নন। কেন এই 'কাল্ট'-কে বাইরে থেকে আমদানি করতে হল, তা বুঝতে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মঙ্গলকাব্য স্মরণে থাকা দরকার। মঙ্গলকাব্যগুলো 'নিচু জাত' ও তাদের পুজোআচ্চাকে প্রামাণ্য হিন্দুধর্মের ছাতার তলায় নিয়ে আসতে পেরেছিল, সেও এমন এক প্রদেশে, যেখানে সিংহভাগ মানুষ সুফি ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী কবিদের রচনায় লৌকিক দেবদেবীরা অবধারিত ভাবে ডাকাবুকো পৌরাণিক দেবতাদের হারাতেন । প্রান্তিক মানুষের পূজিত সাপের দেবী, এক চোখওয়ালা কুরূপা 'চ্যাংমুড়ি বুড়ি' এ ভাবেই হয়ে উঠেছিলেন শিবের থেকেও শক্তিশালী। রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের এতই পরাক্রম যে তাঁর উপাসক লাউসেন পরাজিত করেছিলেন স্বয়ং দুর্গার আশীর্বাদধন্য ইছাই ঘোষকেও। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব হিন্দুধর্মকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে ব্যাপক প্রচার করলেন, পরে নিত্যানন্দও। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম শুধু পৌরাণিক দেবতা কৃষ্ণকে ঘিরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তা হলে শিব ও তাঁর শক্তির কী হবে?

উত্তর পেতে গেলে আরও দুশো বছর এগোতে হবে। অষ্টাদশ শতকে এই বঙ্গভূমি তখন প্রবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব মারা যাওয়ার পর রাজনীতিতে অরাজকতা, তার মধ্যেই মুর্শিদকুলি খান তাঁর নবাবি প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথার মাধ্যমে উদ্ভব হল নতুন এক জমিদার শ্রেণির। মুর্শিদকুলি খান ও বাংলার নবাবরা শিক্ষিত হিন্দুদের পছন্দ করতেন, নাটোরের রাজা-জমিদারের মতো অনেকেই সেই ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠেন। এই সময়েই বহু উত্তর ভারতীয় ব্যবসায়ী পরিবার বাংলায় চলে আসেন, যেমন আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জে জৈনরা, মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠ-উমিচাঁদরা। অযোধ্যা থেকে আসা বিষ্ণুদাস ও তাঁর ভাই ভারমল্লের মতো উত্তর ভারতীয় জমিদার, বা বর্ধমানের রাজারাও (পঞ্জাবের খাতরি বংশভুক্ত) এই সময়েই বাংলায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। অযোধ্যা থেকে আসা দুই ভাই-ই উত্তর ভারতের দশনামী সাধুদের নিয়ে এসে ১৭২৯ সালে তারকনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এর কিছু বছর পরেই বর্ধমানের রাজারা তাঁদের নবাবহাটের মন্দিরে ১০৮ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এমন আরও উদাহরণ আছে।

শিবের পাশাপাশি দেবীপূজার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল স্থানীয় বাঙালি জমিদারদের হাতেই। শাহজাহানের সময়কালে তাহেরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ এবং পলাশির যুদ্ধের পর রাজা নবকৃষ্ণ দেব ও কৃষ্ণচন্দ্রের নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

বাংলায় আসা দশনামী সম্প্রদায়ের হাতে শুধু তারকেশ্বরেরই নয়, এই অঞ্চলের অন্য শিবমন্দিরগুলির ভারও ন্যস্ত হয়েছিল। তারকেশ্বরের ‘ভোলেবাবা পার করেগা’ কেন বাংলায় না হয়ে হিন্দি হল, তার উত্তর লুকিয়ে ওই উত্তর ভারতীয় উৎসতেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলায় দশনামীদের ভূমিকা বেশ বিতর্কিত। ফকির ও সন্ন্যাসীদের পীড়নে এঁদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল, সেই নিয়ে কম ঝঞ্ঝাটও হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অনুপ্রেরণা ছিলেন এই সন্ন্যাসীরাই। কেবল বহিরাগত দশনামী সন্ন্যাসীরাই যে বাংলায় শৈব দর্শনে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তা নয়। গোরক্ষনাথ অনুপ্রাণিত নাথেরাও— যাঁদের মহান্ত এখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী— বাংলায় শৈবধর্ম প্রচার করেছিলেন। পূর্ব বাংলার লোকগানে ‘গোপীচাঁদের গান’-এ আজও তার ছাপ আছে।

শিব বাংলায় গুছিয়ে বসলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর দেহ-মন-আত্মা সবই হয়ে উঠল বাঙালি। আমাদের কাছে তিনি কৈলাসের রাজরাজেশ্বর নন, দরিদ্র, আমুদে, অতি সাধারণ এক কৃষক চরিত্র। তিনি গামছা পরে থাকেন আর মেতে থাকেন তাঁর ‘গণ’দের নিয়ে, যত ক্ষণ না পার্বতী তিতিবিরক্ত হয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করছেন। কৃষক শিবের কথা পাওয়া যায় ‘শিবায়ন’ কাব্যে, ধর্মঠাকুরের ‘শূন্যপুরাণ’ আখ্যানেও।

এ থেকেই বোঝা যায়, পৌরাণিক দেবতাটি ধর্মঠাকুরের মতো স্থানীয় দেবতার পূজা ইত্যাদি থেকে অনেক কিছু আত্মস্থ করেছেন। অনেক বিশেষজ্ঞের সঙ্গেই আমি একটা ব্যাপারে সহমত, ধর্মরাজের চড়ক-গাজন ও সন্ন্যাসীদের বাণফোঁড়, আগুনখেলা, বঁটি-ঝাঁপ ইত্যাদি আচার বৈশাখ মাসে শিবোৎসবের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এই শিব পুরোদস্তুর বাঙালি। আর বাঙালির শিব-ভজনায় তারকেশ্বরের স্থান বোঝা যায় এখানকার বিরাট গাজন দেখে।

তারকেশ্বর-যাত্রা গোড়ায় ছিল পরিশ্রম ও সহনশীলতার পরীক্ষা। আইসিএস অশোক মিত্রের বাঙালির উৎসব সংক্রান্ত লেখায় আছে, ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকেও তারকেশ্বর-যাত্রীদের অধিকাংশই ছিলেন মারওয়াড়ি। ১৯৭৭ সালের হিট বাংলা ছবি ‘জয় বাবা তারকনাথ’ বাঙালিদের মধ্যে শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বর-যাত্রাকে জনপ্রিয় করে তোলে। কিন্তু অবশিষ্ট ভারতবাসীর কাছে এই যাত্রা যেন মজার একটা ব্যাপার। অনেকেই এমনিই যান, বা যাত্রার ওই ক’টা দিনে যে ‘ক্ষমতা’-র স্বাদ পাওয়া যায়, হয়তো বা তাঁর আঁচ পেতে।

সেই উনিশ শতকেই কিন্তু তারকেশ্বর খবরের শিরোনামে এসেছে। ১৮৭০-এর দশকে বাংলা তোলপাড় হয়েছিল একটা মামলার খবরে। নবীনচন্দ্র নামের এক জন তার স্ত্রী এলোকেশীকে হত্যা করে। অভিযোগ এই,

তারকেশ্বরের মহান্তর সঙ্গে নাকি এলোকেশীর সম্পর্ক ছিল। এমনই প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এই ঘটনার যে বিচারকক্ষ মানুষের ভিড়ে উপচে পড়েছিল। সব খবরকাগজ মামলার খবর বার করেছিল, বিচিত্র বর্ণনা সমেত । কালীঘাটের অজস্র পটচিত্রে নবীন-এলোকেশীর কাহিনি ও মামলার বহু দৃশ্য আঁকা হয়েছিল। জনমতের প্রভাবে নবীন শিগগিরই ছাড়া পেয়ে যায়, আর মহান্তকে জেলে পাঠানো হয়। এলোকেশী-কাহিনি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে তারকেশ্বরের পথে এলোকেশীর নামাঙ্কিত নানান জিনিস পাওয়া যেত, তীর্থযাত্রীরা তা সংগ্রহ করতেন। প্রচলিত ছিল ছড়ার ছলে বিজ্ঞাপন: ‘মোহান্তের তেল নিবি যদি আয়।/ ঐ তেল তৈয়ার হচ্ছে হুগলীর জেলখানায়।’

১৯২৪ সালে আর এক মহান্তের কারণে তারকেশ্বর ফের খবরের শিরোনামে আসে। সাধারণ মানুষও এই ঘটনায় খেপে উঠেছিলেন। পঞ্জাবের দুই অকালি নেতা স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দ তারকেশ্বর মন্দিরে এক দীর্ঘ প্রতিবাদ শুরু করেন। বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে তাদের প্রেসিডেন্ট চিত্তরঞ্জন দাশ ও সেক্রেটারি সুভাষচন্দ্র বসু ৮ এপ্রিল তারকেশ্বরে আসেন। চিত্তরঞ্জন দাশের ভূমিকার সমালোচনাও হয়েছিল বিস্তর। মে মাসে তিনি আবারও তারকেশ্বর আসেন এবং কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক ভাবে সত্যাগ্রহ সমর্থন করে। মহান্তের গোর্খা রক্ষীরা আচমকাই বহু সত্যাগ্রহীর উপর কুকরি নিয়ে হামলা করে। মহাত্মা গাঁধীও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রশাসন প্রতিবাদীদের গ্রেফতার করা শুরু করে। ২২ অগস্ট পরিস্থিতির এতই অবনতি ঘটে যে পুলিশ গুলি চালায়। অনেক সত্যাগ্রহী আহত হন। শেষে মহান্ত সতীশ চন্দ্র গিরি অপসারিত হলে অবস্থার একটু উন্নতি হয়।

তিনশো বছর ধরে বাবা তারকনাথ কম ঘটনা-দুর্ঘটনা দেখেননি। এত বছর ধরে এত গঙ্গাজল ওঁর মাথায় ঢালা হয়েছে, তাই মাথা ঠান্ডা আছে হয়তো। চুপচাপ আছেন।